চৌধুরানী

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

এ ইতিহাস আজকালকার দিনে শোনাবার মতো বলেই শোনাচ্ছি।

যদি লিখে রেখে না দিই—এ কথা কেউ জানতে পারবে না। অনেক লোকের উপকার হবে পড়লে এই বিশ্বাসেই লেখা।

আমার ছেলেবেলাতে গ্রামের ওপাড়ায় রামলাল কাকার হাঁকডাক ছিল। সমস্ত মালপাড়ার লোক তাঁর প্রজা, তাঁর মুখের হুকুমে একশো জোয়ান মরদ পুরুষ লাঠি হাতে এগিয়ে আসতো। শক্ত হাতে লাঠি না ধরতে পারলে তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে জমিজমা রাখা যেত না। জমি নিয়ে দাঙ্গা, জমির ফসল লুঠতরাজ—এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রামলাল কাকার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার মায়ের চেয়ে তিন বছরের বড়, তিনি ছিলেন মায়ের সই, তাঁকে সই-মা বলে ডাকতাম। সই-মা তো ভালো ছিলেন বলে শুনিনি, সারা বাল্যকাল ধরে তাঁর নিজের শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর জাহাবাজি ঝগড়ার কথা শুনে এসেছি।

শাশুড়িরা বৌ-এর ওপর অত্যাচার করে একথা বাংলাদেশে সবাই জানে। কিন্তু অত্যাচারিতা অনেক বন্ধু তখন আমার এই সই-মার নামে পুলকিত হয়ে উঠতো।

এমন এক নিপীড়িতা বধূকেই আমি বলতে শুনেছি ঘাটের পথে—বৌ বলতে বৌ হল ওপাড়ার হরির মা। আমরা জন্মেছি ছাগল ভেড়া। শাশুড়িকে কি করে ছেঁচতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েচে।

তাঁর সঙ্গিনী বললে—কাল নাকি সেজগিন্নির মুখে বৌ কেরোসিনের টেমির ছেঁকা দিয়েছে—সেজগিন্নি তাই সহ্যি করে বাপু, আমাদের মতো শাশুড়ি যদি হত—

—সহ্যি না করে উপায় কি বলো। জাঁহাবেজে বৌ যে। পেরে না উঠলে সহ্যি করতেই হচ্ছে বই কি।

—তা ধন্যি বৌ বটে। আষাঢ় মাসে দু'দিন খেতেই দিলে না শাশুড়িকে। মুখের জোরে দাঁড়াবে কে সামনে—সেজগিন্নির কর্ম নয়।

—শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করবার সময়ে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে। অমন বৌ ঘরে ঘরে হলে শাশুড়িরা জব্দ।

—আমরা পারিনে বাপু, ভয় করে।

—সেই জন্যেই ঝাঁটালাথি খাচ্ছি উঠতে বসতে। কাল হয়েচে কি, মুগের ডাল রোদে দেওয়া ছিল, বিষ্টি এসেচে কখন দেখতে পাইনি—খুকির কাঁথা সেলাই করচি—সে কি গালাগাল! আচ্ছা গালাগাল দাও না হয় দিলে—কিন্তু বাপ-ভাই কি দোষ করলে? তাদের তুলে গালাগাল দেওয়া কেন বলো তো ভাই?

—বলবো আর কি! নিজেই দু'বেলা স্বচক্ষে দেখচি, স্বকর্ণে শুনচি। হাড়, ভাজাভাজা হয়ে গেল ভাই। এক এক সময় মনে হয় একদিকে বেরিয়ে যাই—আর ভালো লাগে না—

সই-মা দেখতে শুনতে ভালো ছিলেন। সবাই তাঁকে সুন্দরী বলতো। তাঁর পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে হয়। বড় ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি। অল্পবয়সে জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবী কাজে ভর্তি হোল।

এই সময় সই-মা মারা গেলেন। রামলাল কাকা আবার বিবাহ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিন-চারটি ছেলেমেয়েও হল। কিছুদিন পরে রামলাল কাকা আবার বিপত্নীক হলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিবাহ করলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরও পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে হল।

মাঝের পক্ষের প্রথম সন্তানের নাম আশালতা, বেশ সুন্দরী মেয়ে। রামলাল কাকা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করবার কিছুদিন পরেই আশালতার ভাইবোনগুলি একে একে মারা গিয়ে বেঁচে রইল কেবল সে নিজে।

আশালতার বিয়ে হল এগারো বছর বয়সে এবং সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল। কন্যা বিধবা হয়ে বাড়ি আসার পর থেকে শোকে রামলাল কাকার শরীর ভেঙে পড়লো এবং বছরখানেকের মধ্যে তিনিও

ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এর মুখ্য কারণ কন্যার বৈধব্য নয়, কেননা রামলাল কাকার মৃত্যু হয়েছিল বসন্ত রোগে। ভূমিকা এই পর্যন্ত।

এখন আসল কাহিনি শুরু করা যাক।

আমাদের এ ইতিহাস প্রধানত আশালতার ইতিহাস।

ব্যাপারটি এখন দাঁড়িয়েছে যা তা এখানে আর একবার বলি।

রামলাল কাকার সংসারে এখন কর্তা হয়ে দাঁড়ালো ওঁর প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ। শরতের তখন বিয়ে হয়েছে এবং দুটি সন্তানও হয়েছে। শরতের ছোট ভাই সনতও লেখাপড়া শেখেনি, সে গ্রামেই ধানের ব্যবসা করে। প্রথম পক্ষের মেয়ে কটির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, তারা সকলেই শ্বশুরবাড়ি। রামলাল কাকার তৃতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েগুলির বয়স কম। বড়টি ছেলে, তার বয়েস এই সময় আট।

রামলাল কাকা সম্পত্তিওয়ালা লোক ছিলেন। বড় ছেলে শরৎ এমন দুষ্টু ফন্দি সব আঁটতে লাগলো, যাতে তার নাবালক বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলি সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বিমাতার কোনো কথা এ সংসারে খাটে না, তাঁর বয়সও খুব বেশি কিছু নয়। শরৎ জমি মৌরসী বন্দোবস্ত করতে লাগলো মোটা টাকা নিয়ে। পুকুর জমা দিতে লাগলো নিকিরিদের কাছে মোটা টাকা নিয়ে। গোলার ধান বিক্রি করে ফেলতে লাগলো আড়তদারদের কাছে, তাতে পেতে লাগলো মোটা টাকা। গাছের নারকোল সুপুরি বিক্রি করতে লাগলো কলকাতায় যারা মাল চালান দেয় তাদের সঙ্গে।

অথচ ওর বিমাতা বা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলির পরনে কাপড় নেই, স্কুল-পাঠশালায় যাবার বন্দোবস্ত নেই, যা টাকা পাওয়া যাচ্ছে ওরা তো তার ন্যায্য অংশীদার—অথচ শরৎ বা সনৎ সে চিজ নয়, সোজা পথে হাঁটার অভ্যেস তাদের নেই, বিমাতা মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করেন না নিজের চেয়ে বেশি বয়সের সৎ-ছেলের কাছে।

এভাবে অরাজকতা চলল বছর দুই। শরতের বিমাতা মুখ বুজে সহ্য করেন।

তিনি গরিব ঘরের মেয়ে। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে এসেছিলেন এ সংসারে, যা জোর ছিল এখানে, বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু গিয়েচে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সৎ-ছেলেকে কিছু বলতে সাহস করেন না তিনি। নির্জনে চোখের জল ফেলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা বিষয়-সম্পত্তির কি বোঝে, মহা আনন্দে লাট্টু ঘোরায় আর ঘুড়ি ওড়ায় পথে পথে মাঠে মাঠে।

শীতকাল। সকালবেলা।

শরৎ এক বাটি মুড়ি খাচ্ছে বসে, এখুনি চা খেয়ে সে বেরুবে।

আশালতা এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বল্লে—বড়দা!

শরৎ মুখ তুলে বললে—কিরে?

—একটা কথা তোমায় বলবো?

—কি? বল তাড়াতাড়ি, আমার সময় নেই, কাছারিতে বেরুতে হবে এখুনি।

—তুমি বাগদিপাড়ার জমি বন্দোবস্ত করেছ কত টাকায়?

—কবে?

—এই যে সেদিন করে এলে? বৌদিটির হাতে টাকা এনে দিলে?

—কেন, অত খোঁজে তোমার দরকার কি?

আশালতা মুখ গম্ভীর করে দাদার সামনে এসে দাঁড়ালো। সুন্দরী মেয়ে, নিরাভরণ বিধবার বেশ, চাপা রাগে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। বললে—দাদা আজ আমি যে কথা বলতে এসেছি শোনো, তুমি ও রকম করে বিধু—নিধুকে ফাঁকি দিতে পারবে না বলে দিচ্চি—

শরৎ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এসব কথা যে আশালতা তাকে বলতে পারে, এটাই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না তখনো। অতটুকু মেয়ে আশালতা!

পরক্ষণেই রাগে ও বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুতে গিয়ে আটকে রইল খানিকক্ষণ। যখন কথাটা বেরিয়ে এল অবশেষে, তা বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়লো। তার মানে বোঝা গেল না।

—কি? জমি কার?...টাকা—বিধু-নিধুকে ফাঁকি মানে?

—শোনো দাদা। বিধু-নিধু আছে, ওদের তিনটি বোন আছে। ওদের তুমি দ্যাখো না। মা ভালো মানুষ, তিনি কিছু বলতে পারেন না। ওদের পরনে না আছে কাপড়, না গায়ে একটা জামা। মায়ের একখানা থান, তাই শুকিয়ে নেয়। বিধু বড় হয়েচে, ওঁকে স্কুলে দিলে না। ওরা সব খাবে কি এরপরে?

—কি খাবে সে আমি কি জানি? আমারই বা কি দায় পড়েচে বিধুর পড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার? বাবা থাকতেই তো আমাকে আর সনৎকে পৃথক করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সে সব কথার কি দরকার এখন জিজ্ঞেস করি? তোমার সে সর্দারি করার দরকার কি?

আশালতা দৃঢ়স্বরে বললে—সর্দারি করিনি দাদা, কিন্তু না বলেও আর পারছিনে। মা কিছু বলেন না, কিন্তু এটুকু তো বোঝেন যে বিধু-নিধু ফাঁকে পড়চে। তুমি যে জমি বিলি করলে, বাঁশ ধান বিক্রি করলে, পুকুর জমা দিলে—সে টাকার ভাগ ওরা পাবে না? অথচ ওদের পরনে না আছে কাপড় না আছে ওদের গায়ে একটা জামা—

শরৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—এত বড় কথা তোর! তুই কথা বলতে আসবার কে শুনি? তোর কি ভাগ আছে বিষয়ের? তোর কোন্ জোর এখানে খাটবে শুনি?

—আমার কথা তো একটুও বলিনি দাদা। বিধু-নিধুর ভাগ ওদের দাও—মাকে দাও। শৈলবালার বিয়ে দিতে হবে আজ বাদে কাল, সবই যদি বেচে কিনে ফেললে, কাল শৈলর বিয়ে হবে কি দিয়ে?

—সে ভাবনায় আমার রাত্তিরে ঘুম হচ্চে না। মা গিয়ে বুঝুন তাঁর মেয়ের বিয়ে কি দিয়ে হবে, আমার তাতে কি?

—এই কথা তোমার উপযুক্ত হল দাদা? শৈলর বিয়ে না হলে কার মুখ হাসবে? মা'র না তোমার? লোকে বলবে অমুকের বোনের বিয়ে হল না, ধুমসি করে ঘরে রেখেচে। রাগ কোরো না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার কিছু চাইনে। একবেলা দুটো আলো চালের ভাত, একখানা কাপড়—কিন্তু বিধু-নিধুকে স্কুলে দাও, এর পর ওরা করে খাবে কি? তোমারই দোষ দেবে লোকে, আমাকে কেউ বলতে আসবে না। ভেবে দ্যাখো।

শরৎ একটা বড় ধাক্কা খেলে এই দিনটিতে।

এতদিন তার বিশ্বাস ছিল সে যখন সংসারের কর্তা, সে যা করবে তাই হবে। অবিশ্যি বাবা তাকে ও সনৎকে পৃথক করে দিয়ে গিয়েচেন, কিন্তু হঠাৎ পরলোকগমন করাতে পাকাপাকি কিছু করে যেতে পারেননি বিষয়-আশয়ের। নগদ টাকার দরকার হলেই জমি বিলি, ধান বিক্রি, ইচ্ছামতো খাজনা আদায় ইত্যাদি করলে বাধা দিচ্চে কে তাকে? বিমাতা বাধা দিতে সাহস করবেন না, হাব্দা-গোব্দা ভীতু মানুষ। আজ সে দেখলে এমন একজন আছে, যে তার আঙুল উঁচিয়েচে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ওর খেয়ালখুশির বিপক্ষে। আর সে কি না আশালতা! যাকে কাল দত্ত মশায়ের পাঠশালাতে হাত ধরে জোর করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছে! কেননা ও পাঠশালায় যাবার নামে কেঁদে আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই সনৎকে ডেকে বললে—আশার কাণ্ড শুনিচিস?

—কি?

—ও নাকি আমাকে দেখে নেবে। আমি নাকি নিধু-বিধুকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয়ের বিলিব্যবস্থা করছি। ওইটুকু মেয়ের এত বড় আস্পর্ধা!

—তাই তো।

—এর একটা বিহিত করতে হবে সনৎ। আশার কি জোর খাটে এ-সংসারে?

—তা হলে দ্যাখো।

—তুইও বলবি। আমার সঙ্গেই বলবি।

—বেশ।

—কালই সকালে বলা যাবে। ওকে তাড়িয়ে তবে আর কাজ। বড্ড বাড় বেড়েচে ওর। আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েচে আজ।

—আমি বলবো এখন বুঝিয়ে—

—বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বলার কিছু নেই। ওকে বিদেয় করে দেবো কালই।

—বেশ।

সনৎ তখন দিব্যি রাজি হয়ে গেল, কিন্তু সকালে এসে বললে—দাদা, ওই যে কাল বলছিলে আশাকে বলবার কথা না?

—হ্যাঁ, তা কি?

—আমি ও সব পারবো না। তুমি যা হয় কোরো—

—সে হবে না, তোকেও বলতে হবে—

—আমি ভেবে দেখলাম, ওসব কথার মধ্যে আমার না থাকাই ভালো।

—তুই আমাকে ভয় করিস, না মাকে ভয় করিস?

—কাউকে ভয় করিনে। মা আমাদের দুজনকেই ভয় করে চলে দাদা, সে তুমি জানো। মা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—নিরীহ প্রাণী। তাকে আবার ভয় করবার কি আছে?

—তবে তুই কেন বলবিনে আশাকে?

—না দাদা। আশা আমাদের কোলপোঁছা বোনটা। ওর মা নেই, বাপ নেই, স্বামীপুত্তুর নেই। আমি ওকে ওসব কথা বলতে পারবো না।

শরৎ মুশকিলে পড়ে গেল। দু ভাই একযোগে কাজ করলে যে জোর পৌঁছতো, সে তো পৌঁছলোও না, তার ওপর সে দেখলে আশার ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলে সনতের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া বোধ হয় বিচিত্র নয়। সনৎ এত দরদ দেখাবে আশার ওপর তা কে জানে? একেবারে গদগদ গোদাবরী! বলিহারি!

কিন্তু শরৎ-এ এ ধারণা ভুলও বটে, আবার নয়ও বটে।

সেদিনই সনৎ আশাকে সিঁড়ির নীচের ঘরে নির্জনে ডেকে বললে—তুই কি বলেছিস দাদাকে?

—কেন কি বলবো?

—চোখ রাঙিয়েচিস শুনলাম—

—ওমা, মাথা কুটবো তোর সামনে ছোড়দা। আমি চোখ রাঙাবো বড়দাকে? আমি নেয্য কথা বলিচি—

—কি কথা শুনি?

আশা সব ব্যাপার বললে। বলে কাঁদতে লাগলো।

সনৎ বললে—কেঁদে মরচিস কেন তুই?

—না ছোড়দা, তুই বল, আমি কি অন্যাই কথা বলচি—

—তাই তো।

—আহা, মা'র কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায় ছোড়দা। তুই-ই বল। বড়দা এতগুলো টাকা পেলেন, জমি বিলি করে, জিনিস বিক্রি করে—একটা পয়সা মা'র হাতে দিয়ে বলেচেন, মা তুমি একাদশীর দিন একটু মিষ্টি কিনে খেয়ো কি শৈলকে একটা ফ্রক কিনে দিয়ো? আহা, কিছু পরবার নেই ওর, শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে আমি সেদিন ওর একটা ফ্রক করে দিয়েচি তবে পরে বাঁচে। কে আছে ছোড়দা ওদের মুখের দিকে তাকাবার? মা তো ওই হতগজ—

—হতগজ না ভালোমানুষ!

—তার মানেই তাই। তুমি গায়ে আগুন ঢেলে দাও, রা কাটবে না। এদিকে বিধু নিধু শৈল ভেসে যাক!

—তা তুই আমাকে বললি না কেন, আমি দাদাকে বলতাম—

—তুইও ওই এক রকম ছোড়দা। তোর দ্বারা হত না।

সনৎ আশাকে যতই স্নেহ করুক, সে বেশিদিন বাঁচেনি।সেই বছর শীতের শেষে নিমোনিয়া হয়ে সাত-আটদিন ভুগে সে মারা গেল। আশা দিনরাত রোগীর পাশে বসে সেবা করতো সারাদিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে। মজুমদার গিন্নির মুখে আমি একথা শুনেছি। কারণ সে সময় দেশে থাকতাম না। মজুমদার গিন্নি যার খুঁত ধরতেন না, সে সত্যিই একজন বুদ্ধ বা খ্রিস্ট। মজুমদার গিন্নি বলেছিলেন—সৎমায়ের পেটের বোন বটে, কিন্তু নিজের বোন কমই আছে আজকাল, যারা অমন করে ভাইয়ের সেবা করে।

ওঁর মুখে এইটুকু কথার মূল্য অনেকখানি।

সনতের মৃত্যুর পরে সংসারে শরতের একাধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। বাধা দেবার আর কেউ রইল না। রামলাল কাকার বিষয়সম্পত্তির মধ্যে যা ছিল ভালো, যে জমার খাজনা বিনা মোকদ্দমায় সহজে আদায় হয়, যে পুকুরে মাছ বাড়ে এবং বেশি দামে নিকিরিদের কাছে বিক্রি হয়, যে আমন ধানের ক্ষেতে জল বাধে সকলের আগে এবং শুকোয় সকলের শেষে—এক কথায় দুধের সরটুকু শরৎ গ্রাস করতে উদ্যত হল।

আবার আশালতাকে গিয়ে দাঁড়াতে হল ওর কাছে।

শরৎ চিৎকার করে রেগে তক্তপোশ চাপড়ে কথা বলে, আশা ধীরভাবে মৃদুস্বরে কথা বলে। শরৎ দিন দিন বিস্মিত হচ্ছে, কে জানতো সেই আশা এই মানুষ!

নিধু-বিধুকে নিয়ে গিয়ে শরতের সামনে দাঁড় করিয়ে সেদিন বললে—ছেলে দুটো যে একেবারে বকে গেল, এরা করে খাবে কি? এদের উপায় কি করচো বড়দা?

—আমি কি উপায় করব, তুমি এখন ওদের গার্জেন। হয়েচো, তুমি করো—

—আমি তোমার পায়ের জুতোর তলা বড়দা, আমায় অমন কথা বোলো না।

—তোমাকে আর মিষ্টি কথা শোনাতে হবে না আমাকে, যাও এখান থেকে—

—এদের উপায় কি করবে করো বড়দা, পায়ে পড়ি তোমার।

—মাইনে দেবে কে?

—তুমি!

—কেন আমি দেবো? আমার—

শরতের উত্তরের বাকি অংশটুকু ছাপার উপযুক্ত নয়।

আশা চুপ করে থেকে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি দাদা—এদের লেখাপড়ার হিল্লে করো—বাঁদর হয়ে গেল একেবারে।

—তবে তো আমার—

শরতের সবটুকু উত্তর ছাপবার পুনরায় অযোগ্য হল।

আশালতা পরদিন নিজে কোথা থেকে টাকা জোগাড় করে বিধু-নিধুকে দু-মাইল দূরবর্তী সোনাখালি-বাক্সার মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দিল। ছেলে দুটো বদ হয়ে গিয়েছিল—নিজে জোর করে ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দিত, নিজে সকালে বিকালে পড়াতে বসাতো। আশা নিজে লেখাপড়া জানত সামান্যই—গ্রামের অমর্ত্য গুরুমশায়ের পাঠশালায় বাংলা সরলপাঠ তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত। কিন্তু নিজের চেষ্টাতে সে অনেক শিখেছিল। ওর মামার বাড়ি ছিল কলকাতার কাছে এঁড়েদ’। মা বেঁচে থাকতে সেখানে গিয়ে দু-তিন মাস থাকতো। এঁড়েদ’ থেকে একবার মামীমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা শুনেছিল। আমি অন্তত ওর কাছে একখানা কথামৃত দেখেচি। আশা রামায়ণ মহাভারত পড়তো, গীতা দু-বেলা পড়তো, বাংলা কবিতা কিছু কিছু পড়তো।

সৎমাকে বলতো—নিধু খুব বুদ্ধিমান মা, ওকে পড়ালে মানুষ হবে—

মা বলতো—বিধুকে কেমন দেখলি?

—বুদ্ধি নেই এর মতো, তবে কিছু হবেই।

—তুই চেষ্টা কর, হয়ে যাবে।

আশা যেন উঠে পড়ে লেগে গেল নিধুকে মানুষ করতে। শয়নে স্বপনে ওর এই এক ভাবনা। নিধুর এতটুকু বেচাল দেখলে নিজে শাসন করে, কড়া পাহারায় পড়াশুনো করায়, একদিন স্কুল কামাই করলে ভাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

অথচ আশা আর বিধু-নিধুর বয়সের তফাত খুব বেশি নয়—আট বছরের কি দশ বছরের।

পাড়ার লোকে বলতো—ওদের মা আর কি করে—আশা ওদের দিদিকে দিদি, মাকে মা—

শরৎ চেষ্টার ত্রুটি করেনি ওদের সম্পত্তি ফাঁকি দেবার। আশা না থাকলে ওরা পথের ফকির হত একথায় কোনো ভুল নেই। শরৎ অত্যন্ত কুচরিত্রের লোক, মদ এবং আনুষঙ্গিক সব কিছুই তার ছিল।

একবার মদ খেয়ে বিধুকে ডেকে বল্লে—বিধু, এই কাগজখানাতে একটা সই দিতে বল মাকে—

বিধু একে বড়দাকে ভয় করে, তার ওপরে মাতাল অবস্থায় বড়দা অধিকতর ভয়ের কারণ, ভালোই জানে সে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সে কাগজখানা মায়ের কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে এসে দিলে।

শরৎ চলে গেল।

এর দিন-দশেক পরে আশা নাইতে গিয়ে দেখলে ওদের ঘাটের ধারের বাগানে সাত আটজন লোকের জটলা। পাঁচজন কাঠুরে গাছ কাটছে, দু-জন লোক দাঁড়িয়ে লোক খাটাচ্ছে। আশার সঙ্গে ছিল গোয়ালপাড়ার কালী গোয়ালিনী। সে কালীকে বল্লে—পিসি, গিয়ে জিজ্ঞেস করো তো ওরা গাছ কাটছে কেন?

কালী জিজ্ঞেস করে এসে বল্লে—মাঠাকরুন, ওনারা বললে শরৎবাবু এ বাগানের গাছ বিক্রি করেছে আমাদের কাছে।

—সে কি কথা! জিজ্ঞেস করে এসো কত টাকায় বিক্রি করেচে?

কালী আবার গেল এবং ফিরে এসে বললে—তিনশো টাকায় মা ঠাকরুন—

আশা তখুনি বাড়ি গেল তাড়াতাড়ি স্নান করে। শরতের সঙ্গে কথাটা বলতে শরৎ ধীরভাবে বল্লে—কেন, তোমায় সব জানতে হবে নাকি? তুমি বাড়ির কে? মা'র ভাগ মা সই করে বিক্রি করেচেন, নাবালকদের অছি হয়ে—

—কত টাকা দিয়েছ মাকে?

—সে খোঁজে তোমার দরকার নেই, জিজ্ঞেস করে এসো—

—তা ছাড়া ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি করার কি ক্ষমতা আছে তোমার? পঞ্চাশ ষাট টাকার ফুল বিক্রি হয় বছরে, কেন ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি হবে? মা সই দিয়েচে?

—তোমার কাছে আমি সে কৈফিয়ত দিতে রাজি নই, যাও তুমি—

আশা ছুটে এসে সৎ-মাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, কিছুদিন আগে একখানা কাগজে সই দিয়েছিলেন বটে, তবে কি জন্যে তাঁর সই নেওয়া হল তা জানেন না তিনি। হ্যাঁ, কাল বিকেলে বিধু এসে তাঁর হাতে তিরিশটি টাকা দিয়ে বলেছিল, বড়দা দিয়েচে। তিনি বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিলেন—এই পর্যন্ত।

আশা রেগে বল্লে—তুমি একটি আস্ত বোকা। সই দিতে বল্লে অমনি দিলে? আমাকে জিজ্ঞেস করোনি কেন? তুমি কি জানো কিসের সই?

—তুই তখন বারের পুজো দিতে গিইচিস পঞ্চানন্দতলায়, শনিবারের দুপুরে। তা ছাড়া শরৎ মদ খেয়ে এসেছিল। বিধু ভয়ে কেঁদেই বাঁচে না। জানো তো যমের মতো ভয় করে ওরা শরৎকে।

—তা তো জানি, এদিকে যে দিব্যি ওদের মাথায় হাত বুলোলো বড়দা। তিনশো টাকার বাগান বিক্রি করেচে। তার তিন ভাগের এক ভাগ একশো টাকা তুমি পাবে—সেই জায়গায় তিরিশটি টাকা ঠেকিয়েচে মোটে—উঃ, কি অন্যায় কাজ বড়দার! বোকা বুঝিয়ে দিয়েচে তিরিশ টাকা দিয়ে। তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন এ টাকা কিসের? আচ্ছা মা, এত বোকা হলে মানুষ সংসার করতে পারে? বিধু-নিধু যখন পথে বসবে তখন মজা টের পাবে কে শুনি? তুমি না আমি?

আশা গিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধালে শরতের সঙ্গে। ফাঁকি দিয়ে গাছগুলো এভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া—মায়ের টাকার ভাগই বা দেওয়া হয়েচে কই?

শরৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে—যা যা, যা পারিস, তুই করগে—

আশা রাঙামুখে বল্লে—বড়দা, তুমি এখনো চেনোনি আমায়। নিধু-নিধুকে আর ওই বোকা-সোকা মাকে ফাঁকি দিতে পারো, কিন্তু আমায় পারবে না। এই চল্লাম বাগানে, দেখি কার সাধ্যি বাগানের গাছ কেটে নিয়ে যায়—আয় তো বিধু আমার সঙ্গে—এখনো এত অরাজক হয়নি দেশে বড়দা—

আশা গিয়ে বাগানে যারা গাছ কাটছিল, বিধুকে দিয়ে তাদের বারণ করে পাঠালে—গাছ বিক্রি করা হয়নি বিধুদের অংশের, বাগানের গাছে কেউ যেন হাত না দেয়।

আশার চেহারার মধ্যে এমন কি একটা জিনিস ছিল, সকলে সমীহ করে চলতো। তারা টাকা দিয়ে দলিল লেখাপড়া করে নিয়েছিলো আগেই—তবুও আশার কথায় গাছ কাটা বন্ধ করলে।

শেষ পর্যন্ত শরতের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হল তারা।

এই সব ব্যাপারে শরৎ ক্রমে আশার মহাশত্রু হয়ে উঠলো। ওর ওপরে নানা নির্যাতন শুরু হল—এমন কি বড় ভাই হয়ে বোনের নামে হীন কুৎসা রটাতেও দ্বিধা করলে না।

আশা শরতের কাছে গিয়ে বল্লে—বড়দা, তুমি আমার নামে গাঙ্গুলী কাকার কাছে এসব কি বলে এসেছো?

শরৎ মন দিয়ে হাঁসের পেনের ডগা কাটছিল। শরতের স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে। শরৎ ওর দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বল্লে—কেন এখানে এসেচিস? বলবো না—তুমি বড্ড সতী, তা আমার জানতে বাকি নেই—

—কেন কি করেছি আমি?

শরতের উত্তর ছাপাবার অযোগ্য।

আশা মুখ ফিরিয়ে শরতের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লে-শুনলে তো বৌদিদি বড়দাদার কথা?

শরতের স্ত্রী স্বামীকে অনুযোগের সুরে বল্লে—কি যে, বলো, এত বড় সোমত্ত বোনকে ওই সব—

শরৎ দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে—তুমি চা দিয়ে চলে যাও দিদি, নিজের কাজ দেখো গে—

শরতের স্ত্রী চোখের ইশারায় আশাকে চলে যেতে বলে সেখান থেকে সরে গেল। আশা সে কথা শুনলে না, দুজনে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। পাড়ার লোকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। আশাকে অনেক অপমানজনক কটূক্তি শুনতে হল শরতের মুখে। শেষ পর্যন্ত শরতের স্ত্রী হাত ধরে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল। আশার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—দেখো দিকি বৌদি—কি সব কথা যে উনি বলেন।...শুনছিলে তো বৌদিদি? আমি নাকি—

—তুমি ওবাড়ি চলে যাও ঠাকুরঝি, কেমন মিথ্যে অপমান হওয়া—আমি কি বলবো বলো? আমার বলবার যো নেই কিছু সবই জানো। খিড়কি-দরজা দিয়ে চলে যাও—

কিছুতেই কিন্তু আশাকে দমানো গেল না। সে ডানা দিয়ে আগলে রেখে দিলে বিধু নিধু শৈলকে নয় শুধু, তাদের মাকে পর্যন্ত, যদিও ওর মা তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। গ্রামের লোকে আশাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। অনেকে অনেক রকম সাহায্য পেতো আশার কাছ থেকে। কারো আঁতুড়ে রাত জাগতে হলে আশা, কোনো যজ্ঞি-বাড়িতে রান্না করতে আশা, কারো বাড়ি থেকে পুরুষ অভিভাবক বিদেশে যাবেন, সে বাড়িতে দু-চার দিন শুতে হলে আশা, কারো বাড়ির ডাল বেটে দেবার সময়ে আশা। সারা গাঁ-খানার যে কোনো বিপদে আশাকে সবাই স্মরণ করবে এবং পাবেও। পাবে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটার মতো পাবে—কখনো নিরাশ করেনি কাউকে।

সেবার বৃদ্ধ বেণী হালদার ওকে বল্লেন—দিদি, একটা উপকার করতে হচ্ছে। রাতে কষ্ট পাচ্চি—একটু দুধ পেলে খেতাম। দুধ পাওয়া যায় না, আমি গরিব, আমায় কেউ দেয়ও না। ছনু বোষ্টমের গাই দুধ দিচ্ছে, তুমি গিয়ে বলেকয়ে যদি একপোয়া করে দুধ দৈনিক যোগান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারো—

—দাদু, আপনার ভাত রেঁধে দেয় কে?

—যম। কে দেবে দিদি, এ গাঁয়ে কি কেউ কারো দিকে তাকায়? তোমার দিদি মারা গিয়েচে আজ ছ-বছর, এই ছ-বছরই হাঁড়ি ঠেলচি। ছেলে নেই—মেয়ে থাকে শ্বশুরবাড়ি। আমি না রাঁধলে রাঁধবে কেডা?

—আমি যদি রেঁধে দিই, খাবেন দাদু? যদি আপনার বাত না সারে, রেঁধে দিলে খাবেন?

—খাবো। খেয়ে বর্তে যাবো। দু-হাত তুলে নাচবো। মনে করবো ছিক্ষেত্তরের মহাপ্রসাদ খেলাম। কেন, একথা বললি কেন দিদি?

—আমার নামে নানারকম রটনা রটেছে কি না গাঁয়ে। বড়দা রটিয়ে বেড়াচ্চে—

—আমার মায়ের নামে যদি রটনা রটতো, তবে আমি তাঁর হাতে খেতাম না?

মাস দুই অর্থাৎ সে বার গোটা শীতকাল ধরে রোজ সকালে এসে বুড়ো বেণী হালদারের রান্না করে দিতো আশা। ফলে সেই শ্রাবণ মাসেই যখন বেণী হালদার মারা গেলেন, তখন নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি থেকে দু-বিঘে আমন ধানের জমি তিনি আশার নামে উইল করে দিয়েচেন শোনা গেল। এ নিয়ে মোকর্দমার সৃষ্টি হয়েছিল।

বেণী হালদারের জামাই এসে বললে, ও উইল জাল। সব সম্পত্তি তাঁর ছেলের প্রাপ্য। আশা কে যে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যাবেন তার শ্বশুর? শরৎ বেণী হালদারেরজামাইয়ের তরফে মোকর্দমার গোপনে তদ্বিরও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশার জমি কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

বিধুর লেখাপড়া যেটুকু হয়েছিল তা আশার চেষ্টা ও উৎসাহের ফলেই। নিধু লেখাপড়ায় খুব ভালো, ম্যাট্রিক পাশ করলে বেশ ভালোভাবে। ইদানীং শরৎ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, এদের সম্পত্তিতে হাত দিতে সাহস করতো না, আশাকে ভয় করতো। সেই শরতের বৌ যখন হঠাৎ মারা গেল, আশা গিয়ে শরতের সংসারে বুক দিয়ে পড়লো। ওর ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো, রান্না করে খাওয়ানো, সব কিছু করতো আশা। অবিশ্যি বেশিদিন করতে হয়নি, কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে শরৎ তিন মাসের বেশি দেরি করেনি।

আশা চোখের জল ফেলে বলেছিল—বৌদিদির যে কি গুণ ছিল, তা কেউ জানতো না, আমি জানতাম। বড়দার ভয়ে জুজু হয়ে থাকতো বেচারি, নিজের ইচ্ছেতে কিছু করবার কি তার উপায় ছিল? অমন বৌকে বড়দা চিনতে পারলে না—দু'দিন যেতে তর সইল না, অমনি বিয়ে করে নিয়ে এল।

মাঘমাসের শেষ। আশা শরতের বাড়ি গিয়ে বললে—বড়দা, তোমায় যেতে হচ্চে একবারটি—

—কোথায় যাবো?

—বিধুর বিয়ের জন্যে হাঁটাহাঁটি করচে সাতবেড়ের দুঃখীরাম চৌধুরী, একবার গিয়ে মেয়ে দেখে এসো—

—আমি যাবো?

—তবে কে যাবে বলো। তুমি আমাদের মাথার মণি, বংশের বড় ছেলে, আমাদের সকলের অভিভাবক। তুমি যা ঠিক করবে ওর বিয়ের বিষয়ে, তাই হবে। যাও গিয়ে দেখে এসো বড়দা—

শরৎ খুশি হয়ে মেয়ে দেখে এসে সব ঠিকঠাক করলে বিয়ের ব্যাপারে। ফাল্গুন মাসেই বিধুর বিয়ে হয়ে গেল। বোশেখ মাসে সরাটি-ফুলসারার পাঁচ-আনি জমিদার বাড়ি থেকে নিধুর বিয়ের সম্বন্ধ এল। কেননা, নিধু ভালো ছেলে, সেবার আই.এ. পরীক্ষা দেবে। আশা আবার গিয়ে শরৎকে ধরলে। শরৎকে বললে—বড়দা, বিয়ে তুমি দিয়ে দিয়ো যদি মেয়ে ভালো হয়, কিন্তু নিধুকে যেন তাঁরা আরো পড়ান। পয়সা-কড়ি আমাদের দিতে হবে না তাঁকে, মেয়ের বাবাকে এই কথাটা বোলো বড়দা—

নিধুর বিয়ে হয়ে গেল এখানেই। ওরা নিধুকে বি.এ. পড়াবার খরচ দিতে লাগলো। যেবার নিধু বি. এ. পাশ করে শ্বশুরের যত্নে এম. এ. আর আইন পড়তে ভর্তি হল ইউনিভার্সিটিতে, আশা সেবার খুব অসুখে পড়ল।

ভাদ্রমাসের শেষ। খুব বর্ষা। নিধু কলকাতায়, বিধু মীরপুরের জমিদারি কাছারিতে কাজ করে, সস্ত্রীক সেখানেই থাকে, বাড়িতে কেবল বিধুর মা আর ওদের সকলের ছোট অবিবাহিতা বোন দুলা। আশা ডাক্তার ডাকতে দেবে না—বিধু সামান্য রোজগার করে, ডাক্তারের খরচ পাবে কোথায়? এমনি সেরে যাবে।

রোগ হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো। দুলা দৌড়ে গিয়ে শরৎকে ডেকে নিয়ে এল। শরৎ এসে বল্লে—কি হয়েচে মা? আশার নাকি অসুখ?

ওদের মা কেঁদে বল্লে—বাবা শরৎ, তুমি বাঁচাও আমার আশাকে—ও আমার মেয়ে নয়, ও বিধু-নিধুদের মা, আমি তো মিথ্যে মা হয়েছিলাম। কি করলাম কার? ওই করেচে সব। সর্বস্ব বিষয় বিক্রি করে দাও, আমার মাকে বাঁচিয়ে তোলো। দুপুর থেকে মা আমার অজ্ঞান হয়ে আছে, পাঁচ সাড়ে পাঁচ জ্বর, লোক চিনতে পারচে না, বিছানা হাতড়াচ্চে—

এসব আট দশ বছর আগেকার কথা। বিধু এখন চালের কল আর আড়ত করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে, নিধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসতে পরিবার নিয়ে আছে সম্প্রতি। বড়দিদির কথা বলতে বলতে এখনো ওদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। আশার স্মৃতি আমাদের গ্রামের আকাশ-বাতাস ছেয়ে আছে। এখনো সকলে বলে—সৎ বোন হলেই কি খারাপ হয়—না সৎ-মা সৎ-ভাই হলে খারাপ হয়—আশাকে দেখেচো তো?